ইউনিট ১১

মৃত্তিকা

পাঠ– ১১.১ ঃ মৃত্তিকা ঃ শ্রেণীবিভাগ, মৃত্তিকার ক্ষয় এবং সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ মৃত্তিকা কি তা বলতে পারবেন;
- ☞ মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ গঠন প্রনালী ও গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- ☞ মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ ও সংরক্ষন সম্পর্কে ধারনা পাবেন।

মৃত্তিকার সংজ্ঞা

ভূ-পৃষ্ঠের উপরের একটি আবরণ (Layer) হলো মাটি বা মৃত্তিকা। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, রৌদ্র, হিমবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে শিলা সমূহের ভাঙ্গন ক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত খনিজ পদার্থ, ক্ষয়প্রাপ্ত জৈব পদার্থ, জীবন্ত আনুবীক্ষনিক ও ক্ষুদ্র অনুজীব, বায়ু এবং পানির সমন্বয়ে গঠিত ভূ-পৃষ্ঠের পাতলা আস্তরণকেই মৃত্তিকা বলা হয়। (Chowdhury, 1995)।

মৃত্তিকার সংজ্ঞা কি?

মৌলিক সম্পদ হিসাবে মাটির গুরুত্ব

আমাদের মহাবিশ্বের একমাত্র সবুজ গ্রহ পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের আবরণই মৃত্তিকা। এই মৃত্তিকা আমাদের প্রাকৃতিক মৌলিক উত্তরাধিকার (সূত্রে প্রাপ্ত) সম্পদ। এই সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এর গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ

মৌলিক সম্পদ হিসাবে মাটির গুরুত্ব কি?

১। **পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের আবরণ -** হিসেবে মৃত্তিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জলীয়, গ্যাসীয় ও কঠিন এই তিন অবস্থায় গঠিত জটিল ভূ-জৈব-রাসায়নিক পদার্থ "মাটি সমগ্র পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে।" মানবদেহের চামড়া (চর্ম) এর সাথে এই মাটিকে তুলনা করা যায়। মাটি সাধারণতঃ তাপ কুপরিবাহী। ফলে সূর্যের অত্যাধিক তাপ থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠকে রক্ষা করে এই মাটি।

২। **উদ্ভিদের পুষ্টি ভান্ডার ঃ** মৃত্তিকার প্রধান গাঠনিক উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ। উদ্ভিদ তার গঠন, বৃদ্ধি, পুষ্টি প্রভৃতির জন্য খনিজ পদার্থের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে মাটি হতে খনিজ উপাদান আয়ন রূপে শোষণ করে থাকে। মাটির উর্বরা শক্তির উপর উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

৩। **চাষাবাদ ঃ** চাষাবাদ পদ্ধতি নির্ণায়ক রূপেও মৃত্তিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কোন ফসল চাষ করা হবে।

৪। **সার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ ঃ** ফসলের উচ্চ ফলনের জন্য কি ধরণের সার কি পরিমাণ প্রয়োজন তাও নিয়ন্ত্রিত হয় মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণের উপর । জমির উর্বরতা বৃদ্ধি অথবা নির্দিষ্ট অবস্থায় সুনিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষেত্রেও মাটির ভূমিকাই প্রধান।

সর্বোপরি স্থলজ উদ্ভিদের বন্টন ও বিভিন্নতা নিয়ন্ত্রিত হয় মাটির গুণাগুণ দ্বারা।

১১.১.১ মৃত্তিকার গঠন প্রণালী

মৃত্তিকার গাঠনিক উপাদান হলো বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু এবং ক্ষুদ্র ও আনুবীক্ষণিক জীব। মাটির প্রধান উপাদান খনিজ পদার্থ। এর মধ্যে অক্সিজেন (O_2), সিলিকন (Si), লৌহ (Fe) ক্যালসিয়াম (Ca) ও এ্যালুমিনিয়াম (Al) প্রধান। এ ছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাসিয়াম (K) ও সোডিয়াম (Na) এর লবণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। মাটির উর্বর শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় মাটির বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণগত উপস্থিতির দ্বারা। যেমনঃ

- মাটির বুনন (যা মাটির কনার আকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)।
- মাটির ছিদ্রময়তা বা Porosity (যা মাটিস্থ পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত)।
- মাটিস্থ বায়ু।
- মাটির তাপমাত্রা।
- মাটির পুষ্টি উপাদান।
- মাটির জৈব উপাদান / হিউমাস।
- মাটিস্থ জীব -বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র জীব ও অনুজীব।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌত প্রভাবক যেমন বৃষ্টি, হিমবাহ, তাপমাত্রা প্রভৃতির প্রভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়ায় ভূ-ত্বকের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটি সৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকার গঠন প্রণালী দেখাও

মৃত্তিকা সৃষ্টির এ জটিল প্রক্রিয়াটিকে প্রধানত: ২ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

বিচূর্ণীভবন পদ্ধতি (Weathering) ঃ এ প্রক্রিয়ায় শিলা প্রথমে শুষ্ক ও আর্দ্র এবং গরম ও ঠান্ডা হয় এটি একটি দীর্ঘায়িত প্রক্রিয়ায় যেখানে ভৌত ও রাসায়নিক উভয় পদ্ধতিই কার্যকর। বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে শিলাস্তর চূর্ণবিচুর্ণ হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলা খন্ডে পরিণত হয়।

পেডোজেনোসিস (Pedogenesis) ঃ একটি জীবজ (Biological) জৈবিক প্রক্রিয়া। এই জটিল প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রকার জীব ও অনুজীব যেমন লাইকেন, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল ও ক্ষুদ্র প্রাণী অংশ গ্রহণ করে। Pedogenesis এর সময় নানা প্রকারের জৈব যৌগ, পচনশীল জৈব পদার্থ, জীব ইত্যাদি খনিজ পদার্থে যুক্ত হয়। এভাবে বিগলিত জৈব পদার্থের মিনারেলাইজেশনের ফলে খনিজ পদার্থ উৎপন্ন মাটির বিভিন্ন স্তরে যুক্ত হতে থাকে। স্তরযুক্ত এরূপ পূর্ণাঙ্গ মাটিকে মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র (Soil Profile) বলে। বালি, পানি, কাঁদা প্রভৃতি কণাসমূহ পরস্পর মুক্তভাবে সজ্জিত হওয়ার ফলে মাটির পিন্ড যে আকার লাভ করে তাকে মাটির গঠন বলে। মাটির গঠন বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে, যেমন ঃ (ক) থালাকৃতি (খ) প্রিজমাকৃতি (গ) স্তম্ভাকৃতি, (ঘ) চৌকাকৃতি (ঙ) সুপারী আকৃতি (চ) গোলাকৃতি (ছ) পিন্ডিভূত প্রভৃতি।

পেডোজেনোসিস কি?

১১.১.২ মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটির শ্রেণী বিন্যাস করা হয়ে থাকে যেমন ঃ মাটির গঠন, জৈবিক পদার্থ, বর্ণ, উৎপত্তি, জলবায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য। FAO (১৯৮৮) নির্দেশিত রীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মাটিকে ৪ টি পর্যায়ে (খবাবষ) ভাগ করা যায়।

১। **Major Soil Grouping (প্রধান মৃত্তিকা বিভাগ) ঃ** মৃত্তিকার ২৮টি ধরণের মধ্যে ১০ ধরণের মৃত্তিকা বাংলাদেশে সনাক্ত করা হয়েছে।

২। **Soil Unit (মৃত্তিকা একক) ঃ** ১৫৩ ধরণের এককের মধ্যে বাংলাদেশে ৩২ ধরণের একক পাওয়া যায়।

৩। **Soil sub-unit (মৃত্তিকা উপ-একক) ঃ** ৭৮ ধরণের উপ একক সনাক্ত করা হয়েছে।

৪। **Soil phase (মৃত্তিকা ধাপ/পর্যায়) ঃ** মাটির বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যজনিত বিভাজন যা মাটির ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে।

বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কি কি?

Brammer (ব্র্যামার) কর্তৃক ১৯৬৯ সালে ভূ-প্রকৃতি এবং মৃত্তিকার ধর্ম বৈশিষ্ট্যের মৃত্তিকার গঠন ও রাসায়নিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ-

১। পাহাড়ী মৃত্তিকা।
২। ল্যাটোসোলিক/লোহিত সোপান মৃত্তিকা।
৩। পলল/পাললিক/প্লাবণ সমভূমির মৃত্তিকা।

৪। জলাভূমির মৃত্তিকা।
৫। কোষ মৃত্তিকা।

পাহাড়ী মৃত্তিকা

বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চলে অর্থাৎ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের পাহাড়সমূহে এই মাটি দেখা যায়। এই মাটি টারশিয়ারী মহাকালের বেলেপাথর ও কাদাপাথর দ্বারা গঠিত। এই মাটির রং ধুসর বা ধুসর বাদামী। এই মাটির আনুমানিক আয়তন ১৮৫১০ বর্গ কিলোমিটার এই সকল পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত (২৫৪০ মিলিমিটারের অধিক) হয়। ফলে এখানকার শিলা সমূহ সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্তিকা গঠন করে। এই মাটির পুষ্টি সাধণকারী উপাদানসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারে না বলে কম উর্বর এবং বৃষ্টিপাতের কারণে অম্লধর্মী। এসব এলাকায় প্রধানতঃ জুম চাষ পদ্ধতিতে কৃষি কাজ হয়ে থাকে।

পাহাড়ী মৃত্তিকা কি?

ল্যাটোসোলিক/লোহিত/সোপান মৃত্তিকা

প্রায় ১১০৯৬ বর্গ কি. মি. আয়তনের এই মৃত্তিকা প্লাইষ্টোসিন কালের সোপান সমূহ হতে উদ্ভূত। লালচে-বাদামী রং এর এই মৃত্তিকা বরেন্দ্রভূমিতে 'খিরাড় বা খিয়ার" এবং লালমাই পাহাড় ও মধুপুর গড়ে লালমাটি নামে পরিচিত। অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের কারণে এই মাটি বেশ ক্ষয়প্রাপ্ত। কোণ কোণ স্থানে প্রকৃত ল্যাটোরাইট ও দেখা যায়। শুষ্ক অবস্থায় এ মাটি পাথরের মত শক্ত / কঠিন হয়ে যায়। এ মাটিতে চুন, জৈব পদার্থের পরিমাণ কম এবং লোহা ও এ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইডের প্রাচুর্য থাকায় ম্লধর্মী উর্বরাশক্তি অত্যন্ত কম এবং চাষাবাদের অনুপযোগী। মাটির গঠন এবং রাসায়নিক উপাদানের ভিত্তিতে লোহিত মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত উপবিভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) অগভীর লোহিত পিঙ্গল সোপান মৃত্তিকা।
খ) গভীর লোহিত পিঙ্গল সোপান মৃত্তিকা।
গ) কর্পূ পিঙ্গল সোপান মৃত্তিকা।
ঘ) ধূসর সোপান মৃত্তিকা।

পলল বা পাললিক বা প্লাবণ সমভূমির মৃত্তিকা

নদী বাহিত পলি গঠিত প্লাবণ ভূমিতে পলল মৃত্তিকা দেখা যায়। গঙ্গা, যমুনা তিস্তা এবং মেঘনা নদীর প্লাবণ সমভূমি এ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই এ মাটি দ্বারা গঠিত। এ মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি। গাঠনিক এবং রাসায়নিক স্বাতন্ত্র অনুযায়ী পলল মাটিকে নিম্নোক্ত উপবিভাগে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয় ঃ

- চুন বিহীন পলি মৃত্তিকা।
- চুনযুক্ত পলি মৃত্তিকা।
- অল্প গন্ধকজ লাবনিক মৃত্তিকা।
- পীট মৃত্তিকা।
- প্লাবণ-সমভূমির ধূসর মৃত্তিকা।
- পর্বত পাদদেশস্থ ধূসর মৃত্তিকা।
- অববাহিকার অম্ল কর্দম মৃত্তিকা।
- প্লাবণ সমভূমির চুন বিহীন গাড় ধূসর মৃত্তিকা।
- প্লাবন সমভূমির চুনযুক্ত গাড় ধূসর মৃত্তিকা।
- প্লাব সমভূমির চুনবিহীন পিঙ্গল মৃত্তিকা।
- প্লাবণ সমভূমির চুনযুক্ত পিঙ্গল মৃত্তিকা।
- তরাই এলাকার কৃষ্ণ মৃত্তিকা।

প্লাবণ সমভূমির মৃত্তিকা কিরূপ?

জলাভূমি মৃত্তিকা

স্রোতজ জলমগ্ন সমভূমি এলাকায় এ মাটি বিদ্যমান। খুলনার সুন্দরবন এলাকায় অবস্থিত এমাটি প্রধানতঃ কাদা মাটি। তবে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাবে এ মাটি লবণাক্ত বা লোনা মাটিতে পরিণত হয়। পলিমাটি ও প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থে (পচনশীল গাছপালার অবশিষ্টাংশ) পূর্ণ এ মাটি অম্লগন্ধাজ লাবণিক ফলে কৃষিকাজের জন্য অনুপযোগী।

কোশ মৃত্তিকা (Kosh Soil)

অত্যাধিক অম্লযুক্ত বাদামী বা হলদে বর্ণের চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলের জলমগ্ন মাটিকে স্থানীয় ভাবে "কোশ" মৃত্তিকা বলে । এ মাটি সাধারণতঃ চাষাবাদের অনুপযোগী। ফসফেট জাতীয় সার বা চুন ব্যবহার করে এ মাটিকে উর্বর চাষাবাদযোগ্য করা সম্ভব।

কোশ মৃত্তিকা কি?

১১.১.৩ গঠন অনুযায়ী মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ

গঠনগতভাবে মাটিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

১) **পাথুরিয়া মাটি ঃ** যে মাটিতে পাথর বা শিলার ভাগই বেশি।

২) **বেলে মাটি (Sandy Soil) ঃ** যে মাটির শতকরা ৮০ ভাগই বালু এবং পানি ধারণ ক্ষমতা নেই।

৩) **দো-আঁশ মাটি (Loamy Soil) ঃ** কাদামাটি এবং বেলে মাটি মিশ্রিত হয়ে এ মাটির উৎপতি হয়। এ মাটি সবচেয়ে বেশি উর্বর।

৪) **বালি দো-আঁশ মাটি (Sandy Loan) ঃ** এ মাটি শতকরা ৫৫ ভাগ হতে ৮৫ ভাগ বালু এবং শতকরা ১৫ হতে ৪৫ ভাগ এটেল মাটি দ্বারা সৃষ্ট। ফলে এ মাটির বায়ু ধারণ ক্ষমতা অধিক এবং ঝরঝরে প্রকৃতির হয়ে থাকে।

৫) **এটেল মাটি (Clay Soil) ঃ** হিউমাস ও পানিযুক্ত এ মাটি এটেল কণা অধিক থাকায় বায়ু ধারণ ক্ষমতা খুব কম। ভিজা অবস্থায় এ মাটি আঠালো এবং শুষ্ক অবস্থায় অত্যন্ত কঠিন হয়।

৬) **এটেল দো-আঁশ (Clay-loan) ঃ** বালু, এটেল এবং দো-আঁশ মাটি দ্বারা গঠিত এ মৃত্তিকা পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু ও পানি থাকায় উর্বর হয়।

গঠন অনুযায়ী মৃত্তিকার শ্রেণী বিভাগ কিরূপ?

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

রাসায়নিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেও মাটিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১) **ক্ষারধর্মী মাটি (Alkaline Soil) ঃ** অধিক চুনাযুক্ত পচনশীল উদ্ভিদাংশ জৈব পদার্থ মিশ্রিত এ মাটির pH ৭ এর অধিক। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় সেখানে এ মাটি বিদ্যমান। মাটির পুষ্টি উপাদান সহজে অপসারিত হয় না বলে এ মাটি উর্বর হয় এবং কৃষিকাজের উপযোগী। এ মাটিকে Pedocol (পেডোকাল) বলা হয়।

২) **অম্লধর্মী মৃত্তিকা (Acidic Soil) ঃ** যে মাটিতে ক্ষারের পরিমাণ কম কিন্তু পানির পরিমাণ অধিক, pH ৭ এর কম তাকে অম্লধর্মী মৃত্তিকা বলে।

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কিরূপ?

১১.১.৪ মৃত্তিকা ভেদে কৃষি

বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানকার মোট জনশক্তির প্রায় শতকরা ৬১.৩ ভাগ কৃষিকাজে নিয়োজিত (আদম শুমারী ১৯৮১) মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ ভাগ (প্রায়) আসে এই কৃষি হতে, কৃষির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হচ্ছে জলবায়ু এবং মৃত্তিকা। এদেশের সর্বত্র বৃষ্টিপাত ও ভূ-প্রকৃতি একই ধরণের নয়। ফলে সর্বত্র একই ধরণের ফসল চাষাবাদ করা হয় না। গঠনগত দিক থেকে বাংলাদেশের মাটি খুবই উর্বর। এছাড়া প্রতি বছর বন্যায় প্লাবিত হয়ে পলি জমার ফলে মাটি নতুন হয় এবং উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের দক্ষিণের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ী মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। অম্লধর্মী এ মাটির উর্বরাশক্তি কম এবং ঢালের জন্য পানি জমে থাকে না। তাই এই মাটিতে

চায়ের চাষ হয় এছাড়াও কপি, আনারস, রাবার প্রভৃতির চাষ করা হয়। প্লাইয়োষ্টোসিন কালের ল্যাটোসোলিক মৃত্তিকা গঠিত বরেন্দ্রভূমি, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লার, লালমাই পাহাড়ী এলাকায় চুনের পরিমাণ বেশি। দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় মাটি অনুর্বর, তবে ক্ষার-চুন মিশ্রিত প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে এ মাটিতে ধান, ইক্ষু, আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদির চাষ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকাই পাললিক মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এটেল, বেলে, পলিদোআঁশ ইত্যাদী মাটির কণার বিভিন্নতার জন্য এ মাটি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এ মাটিতে বোরো ও আমন ধান, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদির চাষ বেশি হয়।

খুলনার সুন্দরবন ও উপকূলবর্তী জলাভূমির মাটি লবণাক্ত এবং কাদা। কৃষি কাজের জন্য এ মাটি খুবই অনুপযোগী। তবে প্রকৃতিক ভাবেই এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল যার প্রধান উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গরাণ ইত্যাদি।

চট্রগ্রাম উপকূলে পুনরুজ্জীবিত বেলাভুমি কোশ মৃত্তিকা গঠিত। প্রাথমিক অবস্থায় এ মাটি অনুর্বর হলেও ৫/৬ বছর পর থেকে চাষাবাদ উপযোগী করা যায়।

বাংলাদেশের সর্বত্রই কচু, কলা, লাউ, বেগুন, হলুদ, আম, কাঠাল, আলু চাষ হয়, এছাড়া উপকূলীয় বরিশাল, চাঁদপুর, মহেশখালী, কক্সবাজার এলাকায় নারিকেল, সুপারী প্রচুর জন্মে।

মৃত্তিকা উর্বরশক্তির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কি?

১১.১.৫ মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ ও সংরক্ষণ (Erosion and Conservation of soil)

ভূমির উপরিভাগের উর্বর অংশের মাটি ক্রমেই ধোয়ানী বা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া প্রক্রিয়াকে ক্ষয় (উৎড়ংরড়হ) বলে। এর ফলে নিম্নস্তরের অনুর্বর মাটি স্তর উন্মুক্ত হয়ে পড়ে যেখানে কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে না। বায়ু প্রবাহ, জলস্রোত, বৃষ্টিপাত, তরঙ্গাঘাত সহ বিভিন্ন কারনে ভূ-ত্বকের উপরের অংশের মাটি (ঞড়ঢ়-ংড়রষ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত ও বন্যার জলস্রোতের কারণে অনেক স্থানে ভূমিক্ষয় হয়। সমুদ্রোপকুলে এবং নদী তীরে বায়ু প্রবাহ ও তরঙ্গাঘাতের জন্য ভূমি ক্ষয় হয়ে থাকে।

ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ

১। **বৃষ্টিপাত ও বন্যা (Rainfall and Floods)** ঃ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা নদীতে বন্যার ফলে পানি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে নদীতীর ভাসিয়ে দেয় তখন ভূমি ক্ষয় হয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির পানি ভূমির উপর দিয়ে উচু স্থান হতে নিচু স্থানে বয়ে যায়, ধোয়ানী হিসাবে তখন ভূমিক্ষয় হয়। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ নদীর শ্রোতের দরুন প্রতি বছরই নদীতীরের মাটি ক্ষয় হয় ফলে নদীর নাব্যতা কমে যায়। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় প্রতি বর্ষায় ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্তি পানি জলোচ্ছাসরূপে নদী তীর ছাপিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে দেয়। ভূমি ক্ষয়ের মাত্রাও বেড়ে যায়। তাছাড়া সেচ কার্যের ফলেও ধোয়ানী রূপে ভূমি ক্ষয় হয়। তবে তা খুব ধীর গতিতে ঘটে বলে সহজে বোঝা যায় না। প্রায় প্রতি বছরই বন্যা জলোচ্ছ্বাস, জলস্রোতের ফলে শত শত একর জমির উর্বর ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

২। **বায়ু প্রবাহ (Wind Blowing)** ঃ বায়ু প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হলে ভূমির উপরিভাগের মাটি ক্ষয় হয়। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে গ্রীষ্মকালে ধুলিময় বেলে মাটি, ভূমি কর্ষনের পর ছোট দানার মিহি মাটি বায়ু জোরে প্রবাহিত হলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

৩। **বনোচ্ছেদ (Deforestation)** ঃ অপরিকল্পিতভাবে বেপরোয়া বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে বনোচ্ছেদ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে জ্বালানী কাঠ, রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনে বন জঙ্গল কেটে ফেলে। ফলে মাটি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং মাটি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বনভূমি ধ্বংস হলে পানিশ্রোত বন্ধ হতে পারে না। ফলে মাটিক্ষয় হয়। কারণ বৃক্ষের শিকড় মাটি আকড়ে ধরে রাখে। এতে ভূমি ক্ষয় হতে পারে না।

৪। **অত্যাধিক পশুচারণ (Over Grazing)** ঃ অত্যাধিক পশুচারণের ফলে মৃত্তিকার আবরণ অনাবৃত ও বিনষ্ট হয়। এই অনাবৃত উন্মুক্ত মৃত্তিকা সহজেই বায়ু প্রবাহ এবং বৃষ্টির পানি দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৫। **মাটি কাটা ও স্থানান্তর (Soil Cutting and Shiftment)** ঃ ভূমিক্ষয়ের আরও একটি কারণ মাটি কাটা ও স্থানান্তর। আমাদের দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন-ইটের ভাটা, রাস্তাঘাট, পুল, দালান কোঠা নির্মাণ, খাল ও

পুকুর খনন এর জন্য এক স্থানের মাটি কেটে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। ফলে মাটি উন্মুক্ত হয় এবং প্রাকৃতিক কারণে সহজেই ভূমি ক্ষয় হয়।

৬। **জুম চাষ (Shifting Cultivation)** ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণের পার্বত্য এলাকায় জুম চাষ পদ্ধতিতে পাহাড় কেটে সমতল চাষাবাদ করা হয়। এ ব্যবস্থায় এক জমিতে চাষের পর উক্ত জমিতে চাষ না করে অন্য জমিতে নতুন করে চাষ করা হয়। এর ফলে যেমন মূল্যবান অরণ্য বিনষ্ট হয় তেমন ভূমি ক্ষয়েও সহায়তা করা হয়।

ভূমিক্ষয় রোধ এবং সংরক্ষণ (Protection of Soil Erosion and Conservation)

মাটি আমাদের অন্যতম মৌলিক সম্পদ। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং এর অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উর্বর মাটি কৃষি কাজের জন্য অত্যাবশ্যক। মাটি ছাড়া কৃষিকাজ সম্ভব নয়। এই মাটি সৃষ্টি হতে লাগে শত শত বছর অথচ ক্ষয় হতে সময় লাগে খুবই কম। প্রতি বছরই আমরা প্রচুর পরিমাণে মাটি হারাচ্ছি। আমাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদ মৃত্তিকাকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। ভূমিক্ষয় রোধ এবং এর সংরক্ষণে সরকার এবং জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা সমূহ কি কি?

নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় রোধ এবং ভূমি সংরক্ষণ করা যেতে পারেঃ

১। **বনায়ন (Afforestation)** ঃ সুপরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করে বন সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় রোধ করা যায়। বনায়নের মাধ্যমে মাটিকে বৃষ্টিপাত, বায়ু প্রবাহ প্রভৃতি ক্ষয়ক্রিয়া হতে মুক্ত করা যায়।

২। **ঘাস বা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ রোপন (Turfing)** ঃ এ জাতীয় উদ্ভিদ রোপনের ফলে ভূ-ত্বকের উপরিভাগের মাটির ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

৩। **আবরণ শস্য রোপণ (Cover Crops)** ঃ কৃষি জমিতে শস্য থাকলে মাটি ক্ষয় খুবই কম হয়। তাই মূল ফসল কাটার পর জমি খালি না রেখে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফসল যেমন মটর, কলাই প্রভৃতি বপন করতে হবে।

৪। **নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ (Controlled Grazing)** ঃ একই তৃণভূমিতে সব সময় ব্যাপকভাবে পশু চারণ করলে মাটি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন তৃণভূমিতে নিয়ন্ত্রিত পশুচারণ করা উচিত।

৫। **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ (Scientific Methods of Cultivation)** ঃ জমির পুষ্টি উপাদানের ক্ষমতা রক্ষার্থে বিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যায়ক্রমিক শস্যাবর্তন এর মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় রোধ করতে হবে। এছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিতে চাষ করে মাটি সংরক্ষণ করা যায়। এ সব পদ্ধতির মধ্যে সোপান চাষ (Terrace Cultivation), পাড় চাষ (Contour Cultivation), জুম চাষ (Shifting cultivation) অন্যতম।

৬। **বাঁধ নির্মাণ (Embankment)** ঃ বন্যা ও প্লাবণ ভূমি-ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে নদী তীরে শহর -গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে মাটি ক্ষয় রোধ করা যায়। সরকার এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৩০০০ মাইল দীর্ঘ উপকুলীয় বাঁধ এবং ৮০০টি স্লুইস গেট নির্মাণ করেছে। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মাটি ক্ষয় রোধ করা যায়। বন্যার ফলেই মাটি ক্ষয় বেশি হয়।

৭। **বায়ু প্রবাহ রোধক পর্দা (Wind Screen) :** জমির পাশ দিয়ে বৃক্ষ রোপণ করে বায়ুর বেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৮। **উপযুক্ত ঢাল রক্ষা (Maitaining proper slope) :** রাস্তা ও বাধ তৈরীর সময় প্রয়োজনীয় পরিমান ঢাল রাখলে ভূমি ক্ষয় অনেকাংশে কমানো যায়।

৭। **পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Water Drainage System)** ঃ বৃষ্টি ও বন্যার পানি যাতে আবদ্ধ না থেকে সহজেই সরে যেতে পারে সেজন্য সুসংগঠিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

বর্তমান পাঠ থেকে আমরা বাংলাদেশের মৃত্তিকা সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত ধারনা পেলাম। মাটির সংগা, উপাদান , গঠন প্রণালী ,শ্রেণীবিণ্যাস, বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের মাটির বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধে জানতে পেলাম। মাটি একটি প্রাকৃতিক মৌলিক সম্পদ। মৃত্তিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এর ক্ষয় হবার বিভিন্ন কারন রয়েছে যা আমাদের এ অমূল্য সম্পদকে বিনষ্ট করে। সেজন্য মাটি ক্ষয়ের কারণ এবং তার প্রতিকার/প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কেও জানা প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের দেশের সব জায়গার মাটি এক রকম নয়। মাটিভেদে এর কৃষি এবং উদ্ভিদেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই সে সম্বদ্ধেও ধারনা থাকা দরকার। মৃত্তিকার যথাযথ সংরক্ষণেও সকলকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। ব্রামার (১৯৮৮) মৃত্তিকার _____ ও _____ উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মাটিকে ভাগে ভাগ করেছেন।

২। ঋঅঙ নির্দেশিত রীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের মাটিকে নিম্নোক্ত ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয় _____, _____ _____, _____, ও _____।

৩। চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলের জলমগ্ন উদ্ধারকৃত মাটিকে স্থানীয় ভাবে _____ মৃত্তিকা বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মৃত্তিকার সংজ্ঞা লিখুন।

২. মৃত্তিকা সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করুণ।

৩. মাটির উর্বরা শক্তি নিয়ন্ত্রণকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মাটির ক্ষয় হবার কারণ আলোচনা করুন।

২. ভূমিক্ষয় কি? ভূমিক্ষয় রোধে করণীয় সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।